বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চুয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/জুন ২০২৬
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v44i.009

জমীদার দর্পণ : ঔপনিবেশিক যৌন সহিংসতার তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণ

মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান হাওলাদার *

সারসংক্ষেপ

ভূমি বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর কেন্দ্রিয় ভিত্তি। মুসলিম শাসনামলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটলেও, মীর মশার্‌রাফ হোসেন তাঁর *জমীদার দর্পণ* নাটকে যে জমিদারের চরিত্র অঙ্কন করেছেন তা ঔপনিবেশিক শাসনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিমূল। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে ঐতিহাসিক দলিল ও সমকালীন সাহিত্যিক সাক্ষ্যের সঙ্গে মীর মশার্‌রাফের জমিদারের চরিত্র-চিত্রণের ঐতিহাসিক যথার্থতা নিরূপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এতে নাটকে চিত্রিত জমিদারের যৌন নির্যাতনের দৃশ্যপটকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক সরকারের যৌন-সংক্রান্ত আইনি কাঠামোর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে পদ্ধতিগতভাবে দেরিদা, ফুকো, বাটলার, টার্নার ও বোয়েলের তত্ত্ব প্রয়োগ করে নাটক ও বিচারব্যবস্থার আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করে ঔপনিবেশিক বাংলার শাসন ও বিচারব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও ফ্রানৎস ফাঁনোর ঔপনিবেশিক যৌনতা তত্ত্বের আলোকে দেখানো হয়েছে কীভাবে আইনি ব্যবস্থা যৌন সহিংসতাকে ক্ষমতা প্রয়োগের রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। গবেষণা প্রবন্ধটি নাটকে বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহ ঊনবিংশ শতকের বাংলার ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা মাত্র।

চাবি শব্দ: জমিদার, যৌন-সহিংসতা, মীর মশার্‌রাফ হোসেন, *জমীদার দর্পণ*, কালো বিপদ।

হাজার বছর ধরে ভূমি বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রধান ভিত্তি। ভূমিকে কেন্দ্র করেই সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি কাঠামোয় বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছিল নিশ্চল আবর্তনে।[১] মুসলমান শাসনামলে এ অচলায়তনে কিছুটা পরিবর্তন হাওয়া লেগেছিল, তবে তা পুরনো কাঠামোয় বড় কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেনি। মুসলমান শাসনামলে সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়ার সাথে সাথে ভূমির হিসাব-নিকাশ তথা ভূমি রাজস্ব আদায়ের বিধি-ব্যবস্থায় 'জমিদার' শ্রেণির বিকাশ লক্ষণীয়।[২] এ শ্রেণি প্রাচীন বাংলার গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোতেও বিরাজমান ছিল, তবে তাদের নাম ও কাজের ভিন্নতা মুসলমান যুগের পরিবর্তিত কাঠামো থেকে ভিন্নতর ছিল।[৩] মীর মশার্‌রাফ হোসেন তার *জমীদার দর্পণে* যে ভূ-রাজনীতিকের চিত্র এঁকেছেন তা প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলার ভূমি-ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত শ্রেণি কাঠামোর থেকে ভিন্ন। এ নতুন ভূম্যধিকারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অপকর্মের নির্মম কাহিনি নাটকটিতে বিধৃত হয়েছে নাট্যকারের জবানিতে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০

বাংলার আধুনিক মুসলিম মনীষার অগ্রদূত মীর মশার্‌রাফ হোসেনের জন্ম ১৮৪৭ কুষ্টিয়া জেলায়। *বিষাদ সিন্ধু*'র হৃদয়গ্রাহী বেদনাতুর উপাখ্যান রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলিম মানসে তিনি অমর হয়ে আছেন। সে কারণেই হয়তো অনেকে তাকে নজরুল-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় মুসলিম প্রতিভা হিসেবে বিবেচনা করেন।[৪] পারিবারিকাভাবে 'ধনী কৃষক' ('Rich Peasant')[৫] পরিবারে জন্ম নেয়া মীর সাহেব প্রাথমিক জীবনে বিভিন্ন জমিদারি এস্টেটে চাকুরি করলেও শেষ পর্যন্ত থিতু হয়েছেন সাংবাদিকতায় ও লেখালেখিতে। বাংলা নাটকে উদ্দেশ্যমূলক রচনার গোড়াপত্তন হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের *নীল দর্পণ*-এর হাত ধরে। ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোয় গড়ে ওঠা আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অসংগতি, অন্যায়, অন্যায্যতা, অত্যাচার, আর্থ-সামাজিক অসাম্য ও শোষণ এবং প্রহসমূলক বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাস্তবতার মুখোশ উন্মোচনেই এ প্রহসনমূলক নাট্যধারার সূচনা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর বাস্তব চিত্র উঠে এসেছিল 'দর্পণ' নাটকের হাত ধরে। এ ধারায় এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত নাট্য সংখ্যা ১০টি। প্রহসন নাটকের এ ধারার অন্যতম সংযোজন *জমীদার দর্পণ*। মীর মশার্‌রাফ তাঁর প্রাথমিক কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষদর্শিতার বয়ানে বাঙালি জমিদারদের অমানুষিক নিপীড়ন ও চারিত্রিক কলুষতার কদর্যে ভরা আখ্যান বর্ণনা করেছেন। নাটকের বর্ণনায় এটি অনুমেয় হয় যে, এ দুর্বিসহ অন্যায়-অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে মনঃপীড়ায় ভুগেছিলেন। এ মনঃপীড়া থেকে মুক্তি পেতেই হয়তবা জমিদারের অধীনে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সাংবাদিকতা ও লেখালেখিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি বাঙালি জমিদারের চরিত্র নির্মাণে মীর মশার্‌রাফ হোসেন যে বর্ণনা দিয়েছেন উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে তার বস্তুনিষ্ঠতার অনুসন্ধান। নাটকটিতে যৌন নিপীড়নের যে দৃশ্য রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় তার তাত্ত্বিক কাঠামো আলোচনাই উদ্দেশ্য।

সভ্যতার ইতিহাসে নাটক ও বিচারব্যবস্থা এমন দুটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যা সমাজের নৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ় করে। আইন, প্রমাণ, এবং প্রথার মাধ্যমে আদালত কার্যকর হয়, যেখানে বিচারকের সিদ্ধান্ত এবং আইনের প্রয়োগ সমাজের ন্যায় এবং শৃঙ্খলার প্রতিফলন। অপরদিকে, নাটক মানুষের নৈতিক বোধ, সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতার ব্যবহারকে দৃশ্যায়িত করে, যা আদালতের সীমাবদ্ধ কাঠামোর বাইরে থাকে।[৬] বিচার ও নাটকের এই সম্পর্ককে অন্বেষণ করা মানবিক ও সামাজিক সত্যানুসন্ধানের একটি গভীর বিশ্লেষণ। যেমনটি ফরাসি দার্শনিক জ্যাক দেরিদা মনে করেন, আইন এমন একটি কাঠামো যা ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু ন্যায়ের অস্তিত্ব সবসময় ব্যাখ্যা ও প্রসঙ্গে ভর করে, যা নাটক দৃশ্যায়িত করে।[৭] নাটক এবং বিচারব্যবস্থা উভয়ই মানব অভিজ্ঞতা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার সাথে যুক্ত। ফুকো তাঁর *Discipline and Punish*-এ আদালতকে ক্ষমতার একটি জটিল এবং প্রায়শই অদৃশ্য জাল হিসেবে দেখিয়েছেন, যেখানে বিচারকের নীতি, সামাজিক প্রভাব এবং রাজনৈতিক চাপ বিচার প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়।[৮] নাটক এই ক্ষমতাকে দৃশ্যমান করে। উদাহরণ হিসেবে এসকেইলিয়ান ট্র্যাজেডি ('Aeschylean tragedy') থেকে শুরু করে আধুনিক নাটক পর্যন্ত, ক্ষমতার ব্যবহার এবং ন্যায়বিচারের দ্বন্দ্ব মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জুডিথ বাটলার পারফর্মেটিভিটি তত্ত্বে দেখান, ভাষা এবং কার্যকলাপ কেবল বর্ণনা নয়, বরং সামাজিক বাস্তবতাকে গঠন করে।[৯] আদালতের ভাষা, রায় ঘোষণা, এবং প্রক্রিয়া সকলই পারফর্মেটিভ ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। নাটকও একইভাবে ভাষা এবং অভিনয়ের মাধ্যমে সামাজিক সত্য তৈরি করে। প্রহসনমূলক বাংলা নাটকে বাটলারের তত্ত্বের স্পষ্ট প্রমাণ মেলে, যেখানে জনগণ মঞ্চে নিজেদের জীবনের ঘটনা উপস্থাপন করে, যা সমাজের নৈতিক বোধকে জাগ্রত করে এবং বিচারব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা প্রদর্শন করে। এই প্রক্রিয়ায় নাটক এবং পারফর্মেটিভ আদালত উভয়ই সামাজিক নিয়ম এবং ন্যায়ের পুনঃনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[১০]

মিশেল ফুকো দেখিয়েছেন, আদালত শুধু ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্থান নয়, বরং ক্ষমতা প্রকাশের জায়গা।[১১] আদালত সামাজিক এবং রাজনৈতিক নিয়মকে শৃঙ্খলিত করে এবং ক্ষমতার সম্পর্ককে দৃশ্যায়িত করে। আর নাটক এ ক্ষমতাকে দৃশ্যমান করে। যেমনটি আমরা *জমীদার দর্পণে* দেখতে পাই, যেখানে ঔপনিবেশিক শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার রাজনৈতিক অপকৌশল হিসেবে আদালতকে ব্যবহার করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিনিধিদের চাপে আদালত ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্থলে ক্ষমতার অপব্যবহারকে দৃশ্যমান করেছে। মীর মশাররফের নাটক এখানে জনগণের নৈতিক আদালত হিসেবে কাজ করেছে। এতে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে দৃশ্যায়নের মধ্য দিয়ে সত্য এবং ন্যায়ের অন্বেষণ করা হয়েছে।

দেরিদা দেখিয়েছেন যে, আইন কখনও চূড়ান্ত সত্যকে ধারণ করতে পারে না; আইন ব্যাখ্যা ও প্রসঙ্গে ভর করে।[১২] নাটক এই অনিশ্চয়তা দৃশ্যায়িত করে। ভিক্টর টার্নারের সামাজিক নাট্যতত্ত্ব অনুযায়ী, সমাজের সংকট এবং উত্তেজনা নাট্যরূপে প্রকাশ পায়।[১৩] প্রকাশের এ ধাপগুলো হচ্ছে– সংকট, বিচ্ছেদ, মীমাংসা, পুনর্গঠন– যা আদালতের ধাপের সাথে অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। আদালত যেখানে প্রমাণ সংগ্রহ করে, রায় প্রদান করে এবং সমাজ পুনর্গঠন করে, নাটকও দর্শকের কাছে সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং নৈতিক বিচার তুলে ধরে।[১৪]

অগুস্তো বোল দেখান, নাটক নিপীড়িত মানুষের জন্য এক ধরনের বিচারব্যবস্থা দৃশ্যায়িত করে।[১৫] গণনাট্য এবং সমাজকেন্দ্রিক নাটকে জনগণ নিজের জীবনকাহিনি মঞ্চায়িত করে এবং সামাজিক ন্যায়ের জন্য চেতনা জাগ্রত করে। বোয়েলের এ নাট্য-চেতনার অন্যতম উদাহরণ হিসেবে বাংলা প্রহসন নাটককে উল্লেখ করা যেতে পারে। নাটকগুলো মানুষের স্বাভাবিক ন্যায়বোধ এবং অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।[১৬]

নাটক এবং আদালত উভয়ই সামাজিক সত্য, ন্যায় এবং ক্ষমতার প্রকাশের মাধ্যম। আমাদের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আদালত কার্যকর হয় প্রমাণ, আইন এবং সামাজিক প্রথার মাধ্যমে, যেখানে বিচারকের রায় রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়।[১৭] অপরদিকে নাটক মানব অভিজ্ঞতা, নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক অনিয়মকে দৃশ্যমান করে। বিচারব্যবস্থা কখনও কেবল ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়, বরং শক্তি, রাজনৈতিক ও সামাজিক নিয়ম এবং মানুষের ভয়-ভীতি এবং প্রতিশোধের সঙ্গে যুক্ত। নাটক এখানেই অনন্য, যেখানে দর্শক

সক্রিয়ভাবে বিচার প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা এবং ক্ষমতার প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় দর্শক শুধু দর্শক নয়, বরং বিচারক, সমাজ বিশ্লেষক এবং ন্যায়বোধের ধারক হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করে। গণনাট্য দর্শককে অংশগ্রহণমূলক আদালতের সঙ্গে যুক্ত করে, যা রাষ্ট্রের সীমিত ক্ষমতার বিরুদ্ধে জনগণের নৈতিক ও সামাজিক বিচার নিশ্চিত করে।[১৮] সুতরায় এটা বলা যায় যে, নাটক এবং আদালতের মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক নিহিত রয়েছে। নাটক এবং আদালত একে অপরকে পরিপূরক করে। আদালত যান্ত্রিক এবং প্রথাগত নিয়মের মাধ্যমে বিচার করে, আর নাটক দর্শক এবং সমাজকে নৈতিক এবং সামাজিক বিচার শেখায়।

সুতরাং নাটক ও আদালতের অন্তঃসম্পর্কের বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, নাটক এবং বিচার ব্যবস্থা মানব সমাজের নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে একে অপরকে সমর্থন করে। নাটক প্রতিষ্ঠিত আদালতের সীমাবদ্ধতা প্রদর্শন করে জনগণকে নৈতিক আদালতের অংশ হিসেবে গড়ে তোলে। উভয় ক্ষেত্রেই নাটক বিচার এবং ক্ষমতার সম্পর্ককে পুনর্নির্মাণ এবং দর্শককে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসে। এটি প্রমাণ করে যে, নাটক এবং আদালত শুধুমাত্র মানব অভিজ্ঞতার প্রতিবিম্ব নয়, বরং ন্যায়, সামাজিক সচেতনতা এবং ক্ষমতার শিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম।[১৯] এ সূত্র ধরেই *জমীদার দর্পণে* ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোতে নাটক ও বিচারব্যবস্থার বাস্তবতাই তুলে ধরা হয়েছে। যা জুডিথ বাটলারের পারফর্মেটিভিটি তত্ত্ব এবং মিশেল ফুকোর বিচারিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা প্রদর্শনের মঞ্চের সাথে মিলে যায়।

১

মীর মশার্‌রাফ হোসেন রচিত *জমীদার দর্পণ* নাটকটির প্রধান চরিত্র বাংলার জমিদার। তিনি যে জমিদারের মুখাবয়ব এঁকেছেন তা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সৃষ্টি। বাংলায় জমিদারি প্রথাটি নতুন নয়, তবে নতুন আইনি কাঠামোয় যে জমিদারির গোড়াপত্তন হলো সেটা পূর্বতন জমিদারির থেকে প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিওয়ানি লাভের মধ্য দিয়ে মোগল সম্রাটের অধীনে সরকারের রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হয় এবং জমিদাররা ছিল সম্রাট ও কোম্পানির রাজস্ব আদায়কারী প্রতিনিধি। জমিতে তাদের কোনো দখলিস্বত্ব ছিলো না। নতুন দেওয়ান হিসেবে কোম্পানি সরকার ভবিষ্যৎ স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ভারতবর্ষে তাদের শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করে।[২০] নতুন এ ভূমি ব্যবস্থায় জমিদারদেরকে জমির মালিক ও স্বত্বাধীকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে পূর্বে যারা স্বাধীন কৃষকের রাজস্ব আদায় করতো, তারাই এখন সে কৃষকের ভূমির মালিকানা হরণ করে প্রজা হিসেবে তাদের কাছ থেকে কর আদায়ের অধিকার লাভ করে। এ জমিদারদের পরিচয় দিতে গিয়ে J. H. Harington বলেন,

> … by the terms *Propritor of land,* and *actual proprietor of the soil,* be meant a landholder possessing the full rights of an English landlord, or free-holder in fee simple, with equal liberty to dispose all the lands forming part of the estate… such a designation, it may be admitted, is not strictly and correctly applicable to the Bengal *zamindar*… the relation of

a zamindar to government, and of a *ryot* to a *zamindar*, is neither that of a proprietor, not a vassal; but a compound of both.[২১]

তবে জমিদার শব্দটি ফারসি, আক্ষরিক অর্থে শব্দটির অর্থ 'যার জমি আছে'। শব্দটি পারস্যের ভূমি বা রাজস্ব সংক্রান্ত কোনো নথিপত্রে পাওয়া যায় না, ভারতেই শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় ১৪ শতকে। আবুল ফজল প্রায়শই 'বুমী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন জমিদারের সমার্থক শব্দ হিসেবে। কিন্তু জমিদার শব্দটিই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে জমির মালিকানা বোঝাতে। যদিও অনেকগুলো স্থানীয় নামও জমিদারি স্বত্ব বোঝাতে ভারতে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– অযোধ্যাতে 'সতারহী' বা 'বিশ্বী' অথবা রাজস্থানে 'ভূমিয়ারা' ছিল জমিদার শব্দের যথার্থ প্রতিরূপ। ১৭ শতকের দিকে 'তালুক' বা 'তালুকদার' শব্দটিও জমিদার শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার হতে শুরু করে। যদিও ব্যুৎপত্তিগতভাবে তালুক শব্দের অর্থ সংযোগ, যার সাথে জমিদার শব্দের ব্যবহারিক দিক থেকে কোনো মিল নেই।[২২] তবে জমিদারের সর্বাধিক ব্যবহৃত সমার্থক শব্দ হচ্ছে 'মালিক'। বহু নথিতে 'মিলকিয়ৎ' ও 'জমিনদারি' শব্দদ্বয় একসাথে ব্যবহার করা হয়েছে জমির স্বত্বাধিকারীকে বোঝাতে। অন্য শব্দগুলোতে অস্পষ্টতা থাকলেও মালিক আরবি শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে স্বত্বাধিকারী। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'Proprietor'.

মুহাম্মদ শাহের আমলে আনন্দ রাম মুখলিস নামে দিল্লির একজন কর্মচারী জমিদার শব্দটির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটিকেই যথার্থ বলে মনে হয়। ব্যুৎপত্তিগতভাবে (*দর আসল*) জমিদার বলতে বোঝায় জমির অধিকারী যিনি (*সাহিব-ই-জমিন*)। কিন্তু এখন এর অর্থ দাঁড়িয়েছে কোনো ব্যক্তি যিনি গ্রাম বা শহরের মালিক এবং চাষাবাদ চালাচ্ছেন।[২৩] চাষিদের কখনো কখনো মালিক বলা হতো এটি যেমন সত্য, তেমনি মুখলিসের সংজ্ঞানুসারে তাদেরকে জমিদার বলা চলে না। জমির মালিক মাত্রই জমিনদার নন। কারণ, জমিদারের সঙ্গে ভূমির মালিকানার কথা উল্লেখ নেই। এ-সময়ের প্রায় সকল নথিপত্রে জমিদারির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে তাদেরকে কোনো গ্রাম বা গ্রামের অংশ বিশেষ প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু কী পরিমাণ জমি প্রদান করার হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা নেই। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অনেক গ্রামে কোনো জমিদারি স্বত্বের অস্তিত্বই ছিল না কিন্তু 'রাইয়তী' বা কৃষকের স্বত্বের কথা জানা যায়। তাই সমাজকাঠামোর শ্রেণি বিন্যাসে জমিদার ছিল চাষিকে বাদ দিয়ে তার উপরের তলার একটি গ্রামীণ শ্রেণি।[২৪] ব্রিটিশ নথিতে জমিদারের সংজ্ঞাটি পাকাপোক্তভাবে সকল প্রকারের জমির মালিকানা একচ্ছত্রভাবে জমিদারের সাথেই জুড়ে দিয়ে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, '… zemindar which, literally signifying a possessor of land, gave a colour to that misconstruction of their tenure, which assigned to them an hereditary right to the soil.'[২৫] এক্ষণে জমিদার শ্রেণির উত্থানের ইতিহাসের সাথে পরিচয় ঘটলেই আমরা নির্দিষ্ট করে এ শ্রেণির শাসন-শোষণ সম্পর্কে নাট্যকার *জমীদার দর্পণে* জমিদারের যে চরিত্র উন্মোচন করেছেন তার যথার্থতা বা ঐতিহাসিক সত্যতা প্রতীয়মান হবে।

আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় জন্ম নেয়া এ নতুন শ্রেণি অধিকাংশই ছিল আঠার শতকে ইংরেজ শাসনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠা কলকাতা শহরের নব্য ধনী বণিকশ্রেণি। এরা কোম্পানির দেওয়ানি-বেনিয়ানি-মুৎসুদ্দিগিরি করে, কিংবা হাট-বাজার-ঘাটের ইজারা নিয়ে প্রচুর নগদ অর্থ উপার্জন করেছিল। সূর্যাস্ত আইনের কবলে পড়ে পুরাতন জমিদারিগুলি নিলামে উঠলে তারা তা কিনে নিয়ে নতুন ভূমিদস্যু হিসেবে আবির্ভূত হন। কর্নওয়ালিস এক চিঠিতে কোম্পানির ডাইরেক্টরদের জানিয়েছিলেন যে,'Land property will acquire a value history to unknown in Hindustan and the large capital possessed by many natives which are now employed to the more useful purposes of purchasing and improving land.'[২৬] কিন্তু পরবর্তীকালে যখন কৃষি-উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণে জমিদারদের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠলো তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল দাঁড়ালো, 'The cultivator was reck-rented, impoverished and oppressed.'[২৭] শুধু তাই নয়, বাংলার ভূমি রাজস্ব কমিশনের মতে এ ব্যবস্থা ছিল, 'Imposed on the province an iron framework which has had the impact of stilling the enterprise and initiative of all classes of people.'[২৮] এটাও মনে হয়ে থাকে যে, বাংলার পুঁজিপতিরা জমিদারি এবং মধ্যস্বত্ব ক্রয়ের জন্য তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করতে থাকেন এবং এ প্রবণতা এতোই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বা শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব দেখা দেয়।[২৯] প্রকৃতপক্ষে, ঔপনিবেশিক সরকারের গোড়াপত্তনের সাথে সাথে তার নাগপাশে থাকা সুবিধাভোগী শ্রেণি, যাদের অধিকাংশই শহরে বাস করেন এবং ইংরেজ কোম্পানির সাথে মুনাফাভিত্তিক বাণিজ্যিক কার্যক্রমে জড়িত তারাই বাংলার অধিকাংশ জমিদারি অনায়াসলব্ধ উপার্জন ও মুনাফা লাভের জন্য ক্রয় করেন। বিনা পরিশ্রমে বিনিয়োগের নতুন সংস্থান থেকে আসা অবারিত আর্থিক সচ্ছলতায় শহুরে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা উপভোগের মধ্য দিয়ে নাগরিক সমাজে তাদের আভিজাত্য প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলায় ব্রিটেনের ন্যায় যে কৃষি উন্নয়নের স্বপ্ন দেখা হয়েছিল তা অধরাই রয়ে যায়, কারণ কৃষি জমিতে অর্থ লগ্নির পরিবর্তে নব্য জমিদার বাবুরা লাগামহীন শহুরে জীবনের বিলাসিতায় সকল অর্থ ব্যয় করেছিল।

আপাতদৃষ্টিতে জমিদারি প্রথার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় ওপরে আলোচিত হলো তার ভেতরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ভূমি বন্দোবস্তকে কেন্দ্র করে আরো একটি পরজীবী শ্রেণির উন্মেষ ঘটে। এম. মোফাখ্‌খারুল ইসলাম একে 'মধ্যস্বত্ব সমস্যা' (Problem of Subinfeudation) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৩০] যাদের বসবাস ও আধিপত্যের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হচ্ছে বাংলার গ্রামগুলো, বিশেষত পূর্ব বাংলা। শহুরে কলকাতার বেহিসাবি জমিদারের গ্রামের জমিদারির দেখভালের দায়িত্ব নেয়া এবং স্বত্বভোগের বিনিময়ে পত্তনি নেয়া মধ্যস্বত্বভোগীরাই রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া নতুন একটি পরজীবী শ্রেণির শাসন-শোষণের চিত্রপট রচিত হয়েছে মীর মশার্‌রাফ হোসেনের *জমীদার দর্পণে*। এক্ষণে, একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, মীর মশার্‌রাফ হোসেনের *জমীদার দর্পণে* যে জমিদারের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, সে জমিদারের সঙ্গে ওপরে বিধৃত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারের পার্থক্য রয়েছে। মফস্বলে বা গ্রামে বসবাস করা এ জমিদার সম্প্রদায় ছিলেন কলকাতায় থিতু হওয়া জমিদারদের কাছে থেকে পত্তনি নেয়া মধ্যস্বত্বভোগী। কার্ল মার্কস এদের

উত্থানের পেছনে কারণ হিসেবে মনে করেন যে, পুরনো জমিদাররা কৃষকদের ওপর অত্যাচার করেও টিকে থাকতে পারেনি, বরং তাদের শূন্য স্থানগুলো দখল করে নিয়েছিল ফরিয়ারা যারা আবার সৃষ্টি করেছিল 'পত্তনি' নামে নতুন এক ভূমিস্বত্ব প্রথার।[৩১]

কবে বা কীভাবে পত্তনি প্রথার মধ্য দিয়ে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারির সূচনা হয় তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ১৮১৯ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের আইনি বৈধতার হিসাব মোতাবেক বর্ধমানের জমিদার তার জমিদারিতে 'পত্তনি' নামে এ মধ্যস্বত্ত্বভোগীর আর্বিভাব ঘটান।[৩২] কিন্তু রত্নলেখা রায় মনে করেন যে, জমিতে উপস্বত্বভোগী বা পত্তনিদাররা ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগেই বিদ্যমান ছিল।[৩৩] এ মধ্যস্বত্বভোগীরা আবার পুনঃপুন পত্তনি দিয়ে তাদের পত্তনি নেয়া জমিগুলোতে আরো মধ্যস্বত্বভোগী ইজারাদার নিয়োগ দিয়েছিলেন। ফলে প্রকৃত জমিদারদের সাথে ব্রিটিশ সরকার জমি থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের শর্তে ভূমির মালিকানা প্রদান করেছিলেন, ফি-বছর ভূমিতে মধ্যস্বত্বভোগীর ক্রমবর্ধিত সংখ্যা রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিল কয়েক গুণ। যেমন, এম. মোফাখ্খারুল ইসলাম বাখেরগঞ্জ, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ জেলার ভূমি রাজস্বের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, বাখেরগঞ্জ ও ফরিদপুরের জমিদারির প্রকৃত ইজারা মূল্যের শতকরা ৩০ এবং ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার, ময়মনসিংহে প্রকৃত জমিদারের অধীনে থাকা কৃষকের চাইতে পত্তনিদারদের অধীনে থাকা কৃষকদের ১০% বেশি ভূমি রাজস্ব প্রদান করতে হতো।[৩৪] তাঁরা চাঁদ জমিদারি প্রথা বাতিলের সময়কার একটি বর্ণনায় প্রকৃত জমিদার ও রায়তের মাঝামাঝি এমন ১৫০ জন মধ্যস্বত্বভোগীর কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৫] তথ্যে অতিরঞ্জন থাকলেও জমিদার ও রায়তের মাঝখানে এমন বহু সংখ্যক মধ্যস্বত্ত্বভোগী ক্ষুদ্র জমিদারের বিপুল সংখ্যার তথ্য সমসাময়িক অনেক নথিতেই পাওয়া যায়। যেমন– সাইমন কমিশনের রিপোর্টে রায়ত ও জমিদারের মাঝে ৫০ ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৬] তপন রায়চৌধুরী বাকেরগঞ্জ জেলায় এ ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'We have no clear-cut Pyramid of hierarchically arranged land rights : what we have is a fantastic amalgam of pyramids.'[৩৭]

সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যে জমিদারের পরিচয় আমরা পাই তাদের অযোগ্যতা, অপরিণামদর্শিতা ও আলস্য-ভোগবিলাসের হাত ধরে পূর্ব বাংলায় মধ্যস্বত্বভোগী বা তথাকথিত জমিদারের সংখ্য বিপুল আয়তনে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এদের কার্যকলাপ ও পরিচয় তুলে ধরে প্রটেস্টান মিশনারিদের একটি দল ১৮৫২ সালে এদেরকে সবচেয়ে কুখ্যাত অত্যাচারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং Bengal Legislative Council-এর একজন সদস্য ১৮৫৭ সালের একটি রিপোর্টে এ সকল মধ্যস্বত্বভোগীকে পৃথিবীর সবচেয়ে 'কুখ্যাত নিপীড়ক' ('Oppressive') ও 'চাঁদাবাজ' ('Extortionate') হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৩৮] সুতরাং মীর মশার্‌রাফ হোসেনের নাট্য দর্পণে গ্রাম্য পাতি জমিদারের যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা ইতিহাসের সাক্ষ্য-সূত্র ও সমসাময়িক

সাহিত্যের মেলবন্ধনে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর তৎকালীন সমাজ-রাজনীতি ও আইনি ব্যবস্থাকে সমকালীন নট্যমঞ্চে যথার্থভাবেই চক্ষুষ্মান করে তোলে।

২

মীর মশার্‌রাফ হোসেন তার *জীমদার দর্পণে* জমিদারের যে অবয়ব নির্মান করেছেন ইতিহাসের নিরিখে তা সত্যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ বলে আমাদের ধারণা হয়। কারণ, প্রথমত তিনি নিজে তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রত্যক্ষদর্শী এবং দ্বিতীয়ত তিনি নিজেই এ বিশেষ শ্রেণিভুক্ত, যাদের চরিত্র তাঁর নাটকের দর্পণে নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি পাঠকের উদ্দেশে বলছেন, "নিরপেক্ষ ভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভাল মন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না। জমিদার বংশে জন্ম, আত্মীয় স্বজন সকলেই জমিদার, সুতরাং জমিদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় 'জমীদার দর্পণ' সম্মুখে ধারণ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া ভালমন্দ বিচার করিবেন।"[৩৯] নাট্যকারের এ ভাষ্য সাহিত্যের বিশেষত নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন নয়। সমাজ বিবর্তনশীল। সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে মুহূর্মুহু যে দৃশ্যপট পরিবর্তনের ছবি প্রকাশিত হয় তা কখনো বেগবান, কখনো মন্থর গতির, কখনো চিরায়ত ঐতিহ্যের অনুসারী। আবার কখনো আদর্শিক চেতনা ও ভাবাবেগ মানুষকে আন্দোলিত করে অবিরাম। সদা পরিবর্তিত সামাজিক এ পটভূমিকায় নাট্যকারের মধ্যে যুগের বিচার একটি মানসিক দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয় তার নাট্য রচনার মধ্য দিয়ে। নাটক তাই নাট্যকারের মনস্তত্ত্বগত আত্মপ্রকাশ। এ প্রকাশের মধ্যেই তিনি তার অন্তরাত্মার দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা যন্ত্রণাকে অজ্ঞাতসারেই উপশম করেন নাটকের দৃশ্যপট রনার মধ্য দিয়ে। এখানেই 'ক্যাথারসিস' তত্ত্বের (Catharsis) উন্মেষ।[৪০] আপন বেদনার উপশমই সমাজের সামষ্টিক বেদনার বর্ণনে নাট্যকারকে জনমানসের চৈতন্যে স্থান করে দেয়। নাট্যকার হয়ে ওঠেন তার সমকালীন কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের বিয়োগান্ত চরিত্রের বা পটভূমির প্রভাবক ভাষ্যকার। তার নিজস্ব আবেগ, ধ্যান-ধারণা, মনোজাগতিক দ্বন্দ্ব বা বেদনা প্রকট হয় জনমানসের ভাষ্যে, যা চলে আসছে বহুকাল ধরে। কিন্তু সেই ক্রন্দন, আকাঙ্ক্ষা, নিরাশা, বেদনার বর্ণনা নাট্যকারের নাটক মঞ্চায়িত হওয়ার পূর্বে মূর্তমান হয়নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতির ভাষ্য এভাবেই প্রকট হচ্ছিল নাট্যকারদের লেখনীতে। এরই ধারাবাহিকতায় মীর মশার্‌রাফ হোসেন *জমীদার দর্পণে* যে সাহসী উচ্চারণ করেছেন তার সূত্র ধরে বাংলার জমিদারদের অন্যায়-অবিচারের ও অন্যায্যতার ইতিহাস রচনা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। কারণ, সাহিত্যের ইতিহাস দর্শন এখন আর উপেক্ষণীয় নয়। অশীন দাশগুপ্ত মনে করেন,

> ইতিহাস যে সাহিত্য, এই উপেক্ষিত বক্তব্যও কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়... *কারণ*... ইতিহাস মানুষের, কিন্তু ঐতিহাসিক মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না। সাহিত্য চিরকালই এই কাজটি করেছে এবং এখনও করে। সাহিত্যে যে-সত্যের প্রকাশ, ঐতিহাসিকের তা ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু সাহিত্যিকের স্বাধীনতা ঐতিহাসিক স্বেচ্ছাচার ব'লে স্বেচ্ছায় বাদ দিয়েছিলেন। ইতিহাস ক্রমেই বিজ্ঞানধর্মী হয়ে উঠেছিল। ইদানিংকার ইতিহাসচর্চায় মানুষের মনের কদর বাড়ছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ভিত্তি করেই, ঐতিহাসিক মানসিকতার সন্ধান করছেন।[৪১]

তাছাড়া, বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিযজ্ঞের পেছনে পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ঘাত-প্রতিঘাত প্রত্যেক বাঙালি সাহিত্যিককে প্রভাবিত করেছে। তারা নিজের অজান্তেই নিজ কাজ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা এক একটি ঐতিহাসিক অবস্থায় বাঙালি সমাজের কোনো না কোনো শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছেন।[৪২] উনিশ শতকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর বিভিন্ন রচনায় ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যেকার ত্রুটিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, জাতীয়তাবাদী ও দেশত্মবোধের চিন্তা থেকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক রচনার দ্বারা রাষ্ট্রের শাসনকাঠামোয় পরিবর্তন আনার প্রয়াস পেয়েছিলেন বলে মনে করেন প্রদ্যোত সেনগুপ্ত।[৪৩] এ বক্তব্যগুলোকে সামনে রেখে বলা যায় যে, মীর মশার্‌রাফ হোসেন বাংলার জমিদারদের যে পরিচয় ও কার্যকলাপের প্রতিবিম্ব তুলে ধরেছেন নিজ দর্পণে তার ঐতিহাসিক মূল্য এ সময়ের ইতিহাস চর্চায় বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সমাজ ও রাষ্ট্র ভাবনা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ভাবাবেগের পরিচয় তুলে ধরবে।

*জমীদার দপর্ণে*র প্রস্তাবনাতেই মীর মশার্‌রাফ হোসেন জমিদারদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'মফস্বলে এরকম জানওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ শহরেও বাস করে, শহরে কুকুর, কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর! শহরে তাদের কেউ চেনে না, মফস্বলে দোহাই ফেরে। শহরে কেউ কেউ জানে যে, এ জানওয়ার বড় শান্ত–বড় ধীর, বড় নম্র; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না। বলব কি, জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।'[৪৪] বাংলার জমিদারদের এহেন চরিত্র বর্ণনায় যে অতিশয়োক্তি নেই তার প্রমাণ মেলে ব্রিটিশ নথিতে। জমিদারদের পরিচয় ও চরিত্র তুলে ধরতে তারা বেশ কিছু বিশেষণে তাদের ভূষিত করে, যেমন– '...idiots or of weak understanding; poor creatures sunk in sloth and debauchery; extravagant; necessitous, and therefore exacting; ignorant and rapacious; harbourers of decoits; obstructive zemindars, more plague than profit.'[৪৫] কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম পেঁচার নক্‌শায়*, যে জমিদারের ছবি পাওয়া যায় তার সাথে ব্রিটিশ নথির বর্ণনা ও মীর মশার্‌রাফ হোসেনের জমিদারকে একই সূত্রে গাঁথা যায়, যেমন– '...পাড়াগেঁয়ে দুই একজন জমিদার প্রায় বারো মাস এখানেই কাটান; দুপুর বেলা ফিটন গাড়ী চড়া, পাঁচালী বা চন্ডীগানের ছেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জনদশবারো মোসাহেবের সঙ্গ, বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোষাক,ইনি একজন বনগাঁর শিয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ– বিদ্যায় মূর্তিমান মা।'[৪৬] সুতরাং নাটকে যে '...নক্সাটি এঁকেছে, তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে' বলে নাট্যকার যে দাবি করেন, তা যথাযথ বলে প্রতীয়মান হয়।

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে থাকা জমিদার হায়ওয়ান (জানোয়ার) আলী তার নিরীহ রায়ত আবু মোল্লার ওপর অত্যাচারের খড়ুগ চালিয়েছিলেন শুধুমাত্র ব্যক্তি লালসা চরিতার্থ করতে। কৃষকের সুন্দরী স্ত্রীর ওপর পাশবিক নির্যাতনের জন্য বিভিন্ন ফন্দি এঁটেছিল জমিদার হায়ওয়ান আলী–

> হায়। একটা ভান করে মোল্লাকে ধরে আনা যাক। এদিকে একটু নরম গরম আরম্ভ করে ওদিকে কৃষ্ণমণিকে পাঠিয়ে দেই। সে গিয়ে বলুক যে, তুমি আজ সন্ধ্যার পর একবার বৈঠকখানায় গে দেখা কর, সব গোর চুকে যায়।[৪৭]

এ রকম 'ভান করে' রায়তের ওপর জমিদারের নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা তৎকালীন সংবাদপত্রগুলোতে প্রায়শই চোখে পড়ত। জমিদারের অধীনে থাকা সমস্ত প্রজার যা কিছু সম্পত্তি বা ভোগ্যবস্তু সবই তারা নিজেদের মনে করত। গাছের ফল থেকে রায়তের পরিবারের প্রতিটি সদস্যই জমিদার তার আপন সম্পত্তি মনে করতো। উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্রের পাতায় পাতায় জমিদারের এ নির্মম হৃদয়বিদারক অত্যাচারের মর্মস্পর্শী বিবরণ রয়েছে।[৪৮] এরই ধারাবাহিকতায় আবু মোল্লার স্ত্রীকে সম্ভোগের জন্য নানা উপায়ে তার ওপর অত্যাচার করেছিল হায়ওয়ান আলী। প্রথমে মিথ্যা অজুহাতে রায়ত আবু মোল্লাকে কাছারিতে ধরে এনে অন্যায্যভাবে পঞ্চাশ রুপি দাবি করে। আবু মোল্লা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না যে, কেন তাকে পঞ্চাশ রুপি দিতে হবে। কারণ এটা তার বছরের আসল জমা ও আবওয়াবের বাইরের আদায়। কিন্তু হায়ওয়ান আলী কোনো কারণ ব্যাখ্যা ছাড়াই এ দাবি অনাদায়ে আবু মোল্লার মাথায় 'চোদ্দপোয়া' ইট চাঁপিয়ে সারারাত দাঁড় করিয়ে রাখার শাস্তি বিধান করেন।[৪৯] এ অন্যায্য-অত্যাচারের বিবরণ তৎকালীন পত্রিকা *তত্ত্ববোধিনী*-র পাতায় অহরহ ছাপা হতো। এ পত্রিকায় **১৮** রকমের শারীরিক নির্যাতনের যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সঙ্গে মিলে যায় আবু মোল্লার ওপর হায়ওয়ান আলীর অত্যাচার। রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ ও আরও বিশজন মিশনারি জমিদারদের এ অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে বলেন যে–

> The zemindars are almost all, however, in the habit of treating their ryots, not merely as their tenants, but as their serfs. … These practices are almost universal. … It is not unusual (1852), especially at considerable distance from the civil stations, for zemindars to go still further in the abuse of their power, by inflicting imprisonment and torture upon any ryot who may have incurred their displeasure.[৫০]

রায়ত জানে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইনি সহায়তা চেয়েও যে কোনো লাভ হবে না, আবু মোল্লার বোন আমিরন এ কথাই বোঝানোর চেষ্টা করেছিল নুরুন্নেহারকে,

> মাটির হাকিমে মেরে ফেল্লে তুমি কি কর্বে? তাঁর নামে তো আর সাএবদের কাছে নালিস কর্তে পার্বে না? নালিস কল্লে এই হবে, একদিন তোমার ভিটেয় পুকুর করে দেবে। জমীদারের সঙ্গে কার কথা, সে কি না কর্তে পারে।[৫১]

জমিদার যেনো সকল কিছুর উর্ধ্বে, তিনি যে কোনো সময় যে কোনো উপায়ে তার প্রজাকে অত্যাচারের বানে জর্জরিত করতে পারেন। আমিরনের শঙ্কার কথা সদর দিওয়ানি আদালতের জজ H. C. Halkett জানেন, তাইতো তিনি বলছেন, 'Where the zemindar is disposed to behave tyrannically, nothing whatsoever that I can see interposes to prevent his attaching property for pretended arrears, where, when, and from whatever tenant he pleases to make his victim.'[৫২] প্রকৃতপক্ষে, সে সময় জমিদার সকল কিছুর ওপরই তার কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন বা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আইনি কাঠামো তার হাতের পুতুল হিসেবেই কাজ করেছে। গ্রাম্য চৌকিদার থেকে শুরু করে থানা-পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট বা মফস্বল

জজদের সকলেই জমিদার পক্ষের হয়েই বিচারের রায় দিয়েছেন।[৫৩] তাই জমিদারের প্রেরিত দূতী কৃষ্ণমণি নূরন্নেহারকে এ কথাই বুঝিয়ে বলেছিল যে, জমিদারের ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে বাড়ির বউকে তুলে নেয়ার। জমিদার যেহেতু যার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেছে, তাকে শেষ পর্যন্ত তার সম্ভ্রম ত্যাগ করে প্রাসাদে যেতেই হয়েছে। কৃষ্ণমণি আরও বুঝিয়ে বলেছিল, যে নারী স্বেচ্ছায় জমিদারের নিকট গিয়েছে তার বৈভবের কোনো কমতি হয়নি। কিন্তু যারা যায়নি জমিদার তাদেরকে ভিটে-মাটি ছাড়া করেছে। সুতরাং নুরুন্নেহারের উচিত জমিদারের কাছারিতে যাওয়া।[৫৪] অন্যথায়, যে কোনো অজুহাতে জমিদারের খড়্গহস্ত নেমে আসবে নূরুন্নেহার ও তার পরিবারের ওপর। দূতীর এ সতর্কবার্তা অমূলক বা মিথ্যা ভনিতা নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় রেভারেন্ড জেমস লং ও ২০ জন পাদ্রী জমিদারের এ ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত সাক্ষ্যে এবং তাঁরা বলেছেন যে,

> …Thus, while the zemindar has been rising in wealth and power, the tenant has been sinking into penury and dependence, subject to illegal and exhausting exactions, harassed by contending proprietors, and oppressed by the exercise of extra judicial powers. These zemindars have, since the perpetual settlement, not only acquired by law the power of enforcing their demands by exparte proceedings, commencing with the arrest and imprisonment of the tenants, but have also received the sanction of the law, as already stated, to their custom of enforcing the personal attendance of their tenants at their pleasure; and both these powers, especially the latter, your petitioners believe they often greatly and shamefully abuse.[৫৫]

প্রজাকুল জমিদারের অন্যায়-অত্যাচার ও ব্যক্তিগত সম্ভ্রম থেকে শুরু করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কোনো মর্যাদাই রক্ষা করতে পারেনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারি দুঃশাসন। তাইতো রায়ত আবু মোল্লার কাছে দাবিকৃত অন্যায্য অর্থ প্রদান করতে না পারার অজুহাতে স্ত্রী নূরন্নেহার জমিদারের লালসা চরিতার্থ করার কুপ্রস্তাব প্রদান করে। এতে তার স্ত্রী রাজি না হওয়ায় তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করে এবং জমিদারের এ ঘৃণ্য পাশবিক নির্যাতনে আবু মোল্লার গর্ভবতী স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পরের দৃশ্য আরো বেদনাদায়ক। আবু এ হত্যার বিচার চাইতে জমিদারের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করে। কিন্তু বিচারক যেখানে জমিদারের পক্ষের লোক সেখানে বিচারের নামে প্রহসন হলো। হায়ওয়ান আলীর হয়ে সাক্ষীগণ একে একে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করতে থাকে এবং অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য স্বয়ং বাদীই দায়ী। এমনকি লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে ইংরেজ সাহেব ডা. এফ. বি. ক্যানিংহামও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি দাবি করেন যে, কোনো পাশবিক নির্যাতনের নমুনা তিনি নূরন্নেহারের দেহে পাননি। তার মৃত্যুর কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেন এভাবে– '... No markesof external violence except on the genetal, profuse discharge of blood from the said part; the lungs highly conjested on digesting away the skin of throat, extravasation of blood observed, all other organs found healthy. … In my opinion she must have died of sanguineous apoplexy of the brain.'[৫৬] মোদ্দাকথা হচ্ছে, আবুর স্ত্রী ধর্ষণে নয়, বরং মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা গিয়েছে।

যদিও তার নিম্নদেশ রক্তে ভেসে গিয়েছে, যা কিনা নির্যাতনের স্পষ্ট আলামত। কিন্তু বিচারক তা আমলে না নিয়ে জমিদার হায়ওয়ান আলীকে বেকসুর খালাস দিয়ে দেন।

৩

নাটকে বিচারক ও বিচার ব্যাবস্থার যে নজিরবিহীন প্রহসনের কথা নাট্যকার তুলে ধরেছেন তা কোনো কাল্পনিক ঘটনা নয়। বাংলা বা ভারতে বিচারকদের এ প্রহসনমূলক বিচার কার্যক্রমের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৮০৫ থেকে ১৮৫০ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, সদর নিজামত আদালতে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি হত্যা মামলা নথিভূক্ত হয়েছিল যেখানে ঘরের স্ত্রীলোককে দুঃশ্চরিত্রা বা ডাইনি হিসেবে চিহ্নিত করে অথবা অবৈধ সম্পর্কের অপবাদ দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। সদর নিজামত আদালতে ব্যভিচারের অভিযোগ এনে এ রকমের ৩১টি মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছিল 'ন্যায্য হত্যাকাণ্ড' ('Justifiable Homicide') হিসেবে। সর্ব্বোচ্চ আদালতে এহেন অমূলক ও অন্যায্য প্রহসনমূলক রায় দেওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, 'British administrators saw the physical abuse and murder of Indian women by Indian men as a social problem that should be handled by Indians themselves and not by the colonial state. Consequently, no special commissions of inquiry were ever set up by colonial reformers to examine or control it.'[৫৭] তাই হয়তো হায়ওয়ান আলী কর্তৃক নূরুন্নেহারের নির্যাতিত হওয়া এবং নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে খুব তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সঙ্গে লোক দেখানোর প্রহসনমূলক বিচার কার্য সম্পন্ন হতে দেখা যায়।

এ বিচার প্রক্রিয়ার একটি তাত্ত্বিক কাঠামো এ পর্যায়ে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এশিয়া ও আফ্রিকাতে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপিয়ান উপনিবেশগুলোতে আন্তঃজাতীয় যৌন সহিংসতা ও নিপীড়নকে দু'টি তাত্ত্বিক কাঠামোর ভেতর দিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রথমত, সাহিত্যের চিন্তকগণ যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণকে সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত বিজয় ও সংঘাতকে জিইয়ে রাখার কৌশল এবং উপাদান হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।[৫৮] দ্বিতীয়ত, অন্যদিকে, ইতিহাসবিদদের প্রবণতা হচ্ছে, কথিত ধর্ষণের রাজনীতি এবং ঔপনিবেশিক উদ্বেগকে 'কালো বিপদ' ('black peril') হিসেবে চিহ্নিত করা। যেখানে স্থানীয় পুরুষ কর্তৃক সাদা নারীদের যৌন হয়রানি অনুভূতিকে নির্দিষ্ট করে।[৫৯] এ দু'টি তাত্ত্বিক কাঠামোই বিতর্কের কেন্দ্রিভূত বিষয়, যেখানে জোর দেওয়া হয়েছে যৌন সহিংসতার ওপর। উদ্দেশ্য ছিল 'সাম্রাজ্যকে অস্থিতিশীল' ('tensions of empire') করতে অন্যান্য উপাদানগুলোর ভূমিকা বুঝতে কীভাবে এটি সাহায্য করে তা দেখানো।[৬০] এতদ্বঞ্চলে যৌন অপরাধের বিচারকার্য পরিচালনায় জাত-পাত এবং সামাজিক শ্রেণিকাঠামোও বিচার বিভাগের তদন্তকে প্রভাবিত করতো। এছাড়া ব্রিটিশ বিচারকদের ধারণার মধ্যে এতদ্অঞ্চলের সামাজিক মর্যাদা, যৌনতা এবং অপরাধের মধ্যকার সম্পর্ককে নিয়ে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসেবে পুত্তু এবং দোনি সিরদার মামলার নথি পর্যালোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্টত বোঝা যায়। সেশন কোর্টে যৌন নির্যাতনের মামলায় বিচারক মনে করেন আসামীর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে এ নারী ইচ্ছাকৃতভাবেই তার সাথে

যৌন সম্পর্কে জড়িয়েছে। অথচ, নিচু জাতের এ চরিত্রহীনা মহিলা আসামির শত্রুদের প্ররোচনায় তার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এনেছে বলে বিচারক দাবি করে আসামিকে খালাস দিয়ে দেন। পরবর্তীকালে মামলাটি সদর নিজামত আদালতে আপিল করা হলে প্রকৃত ঘটনা বের হয়ে আসে এবং দোষীকে সাজা দেয়।[৬১] অর্থ্যাৎ নিম্ন আদালতে 'কালো বিপদে'র ধারণাটি লক্ষণীয় এবং এটিকে জিইয়ে রেখে সর্বোচ্চ আদালতে ন্যায্যতা পাওয়ার নাটকীয়তার মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার উপনিবেশকে টিকিয়ে রাখার ন্যায্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এখানে ফ্রান্‌ৎস ফ্যানন (১৯২৫-১৯৬১)-এর ঔপনিবেশিকরণে যৌন সহিংসতা ও যৌনতার রাজনীতি-বিষয়ক চিন্তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে ফ্রান্‌ৎস ফ্যানন এক অনিবার্য নাম। বর্ণবাদ, ঔপনিবেশিক সহিংসতা, মানসিক দাসত্ব, এবং মুক্তির সংগ্রামের ওপর তাঁর লেখাগুলো শুধু আফ্রিকা বা ক্যারিবিয়ান অঞ্চলেরই ইতিহাস নয়, বরং বিশ্বের উপনিবেশায়নের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করার জন্য আজও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফ্যাননের কাছে দেহ কখনোই শুধুমাত্র জৈবিক সত্তা নয়; বরং বর্ণবাদী শাসনের ভেতরে দেহ একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা। দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে, ভয় দেখিয়ে এবং আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক রাজনীতির বক্তব্য রচিত হয়েছে। *Black Skin, White Masks*–এ তিনি যে 'racial epidermal schema'–এর কথা বলেন, তা দেখায় কীভাবে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি কালো মানুষের দেহকে চিহ্নিত করে, তাকে অবমূল্যায়ন করে এবং ক্ষমতাকে সম্পর্কের কাঠামোতে বন্দি করে। ঔপনিবেশিক যৌনতার মৌলিক তিনটি বৈশিষ্ট্য ফ্যানন চিহ্নিত করেন : যৌনতা রাজনৈতিকভাবে নির্মিত; বর্ণবাদ যৌনতাকে কাঠামোগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে; এবং শ্বেতাঙ্গ পুরুষতন্ত্র যৌন সহিংসতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে একদিকে উপনিবেশায়িত নারীর দেহ হয়ে ওঠে শাসনের প্রতীকী 'দখলভূমি', অন্যদিকে পুরুষের দেহ হয়ে ওঠে শ্বেতাঙ্গ ভয়ের ও বর্ণবাদী কল্পনার কেন্দ্র।[৬২]

ফ্যানন *A Dying Colonialism*–এ আলজেরীয় নারীর পর্দা, দেহ, পোশাক ও যৌনতার রাজনৈতিক নির্মাণের চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। ফরাসি ঔপনিবেশিক বাহিনী নারীদের পর্দা খুলতে বাধ্য করা, তাদের দেহ তল্লাসি করা, এমনকি নিয়মিত ধর্ষণকে রাষ্ট্রীয় কৌশল হিসেবে ব্যবহার করত।[৬৩] যেহেতু নারীর দেহ ছিল সমাজের সম্মান, ঐতিহ্য, পারিবারিক কাঠামো এবং জাতিগত পরিচয়ের প্রতীক। একে হেয়-প্রতিপন্ন করার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় নীতির অংশ হিসেবে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ফ্যানন দেখান যে, নারীকে অপমান করা মানে সমগ্র জাতিকে অপমান করা। ফলে যৌন সহিংসতা কোনো বিচ্ছিন্ন অপরাধ ছিল না, বরং এটি ছিল 'colonial pedagogy of terror'– এক ধরনের রাষ্ট্রীয় পাঠ, যা উপনিবেশকে বুঝিয়ে দিত কে মালিক এবং কে দখলকৃত।[৬৪]

আবার, ফ্যাননের লেখায় শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য কালো পুরুষের দেহকেও তিনভাবে যৌনীকরণ করে– অতিরঞ্জিত যৌনশক্তির অধিকারী হিসেবে, কামনার বস্তু হিসেবে, এবং অপরাধপ্রবণ ভয়ংকর সত্তা হিসেবে।[৬৫] উভয় লিঙ্গের তা পুরুষ হোক বা নারী হোক যে বিপরীত চিত্রপট আঁকা হয়েছে, তা করা হয়েছে একই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কালো দেহকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে। ফ্যানন

মনে করেন শ্বেতাঙ্গ নারী ও কালো পুরুষের যৌনতা কখনোই ক্ষমতাহীন রোমান্টিক আকর্ষণ নয়; বরং বর্ণবাদী আধিপত্যের ভেতরে এক ধরনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক। ফ্যাননের মতে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যৌন সহিংসতাকে ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে নয়, বরং যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। আফ্রিকা, ভারত, ক্যারিবিয়ানসহ সকল উপনিবেশেই এটি সত্য। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রধান লক্ষ্য ছিল– মানসিক ভীতি সৃষ্টি, সামাজিক ভাঙন তৈরি, দেহের ওপর রাষ্ট্রীয় দখল প্রতিষ্ঠা, পুরুষত্বকে দুর্বল করে প্রতিরোধকে নিষ্ক্রিয় করা। এই সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু ছিল যেমন নারী, তেমনি পুরুষও। ঔপনিবেশিক বাহিনী পুরুষদেরকেও যৌন নির্যাতনের শিকার করত, যা আধুনিক গবেষণায় ক্রমশ আরও স্পষ্ট হচ্ছে।[৬৬] ফ্যাননের এ তত্ত্ব কেবল আফ্রিকায় সীমাবদ্ধ নয়; এটি দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষত বাংলার ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন, আঠারো শতকের শেষ থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আদর্শিক যুক্তি ছিল যে 'স্থানীয় পুরুষরা নারীর প্রতি নিষ্ঠুর', আর ব্রিটিশরা নারীকে উদ্ধারকারী হিসেবেই এখানে এসেছেন। সতীদাহ প্রথা বিলোপের মতো ঘটনাকে ব্রিটিশরা ব্যবহার করেছিল 'white men saving brown women from brown men'–গায়ত্রী স্পিভাক একে একটি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৬৭] এটি ব্রিটিশ পুরুষতন্ত্রকে ভারতীয় নারীর দেহকে শাসনের আওতায় নিয়ে আসার নৈতিক কর্তৃত্ব দিয়েছিল। একইভাবে নীলকুঠি মালিক ও লাঠিয়ালদের দ্বারা বাঙালি কৃষাণীদের ওপর নির্যাতন, অপমান ও ধর্ষণ ছিল নীল বিদ্রোহের অন্যতম উপাদান। মেহতা ও সুমিত সরকারের গবেষণায় দেখা যায়, যৌন সহিংসতা ব্যবহার করা হতো কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করতে।[৬৮] ফ্যাননের ভাষায়, এটি 'economic coercion through sexual terror'– অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ভাঙার একটি যৌন-রাজনৈতিক কৌশল।[৬৯]

উনিশ শতকে 'Contagious Diseases Act' (১৮৬৮) ব্রিটিশ সেনাদের যৌন রোগ থেকে 'রক্ষা' করার উদ্দেশ্যে কলকাতা ও ঢাকার 'নটিখানা'র নারীদের বাধ্যতামূলক পরীক্ষা চালু করে।[৭০] এটি এক স্পষ্ট যৌন-ঔপনিবেশিক নীতি যেখানে নারীর দেহ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন; যেখানে নারীর দেহকে সামরিক যন্ত্রের অংশ হিসেবে দেখা হয়েছিল, এবং শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের যৌন নিরাপত্তার নামে স্থানীয় নারীর স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। দেশভাগের সময় (১৯৪৬-৪৭) পূর্ববঙ্গ ও কলকাতায় ঘটে যাওয়া দাঙ্গায় মুসলিম-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের নারীরা ব্যাপকভাবে ধর্ষণ, অপমান, এবং অপহরণের শিকার হন। সুরুচি দত্ত ও লতিকা সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন এ যৌন সহিংসতা ছিল জাতিগত শুদ্ধতা, প্রতিশোধ এবং ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক ভাষা।[৭১] ফ্যাননের তত্ত্বের সঙ্গে সবচেয়ে গভীর সাদৃশ্য পাওয়া যায় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিকল্পিত যৌন সহিংসতার। এটা করা হয়েছিল নারীদের অপমান করে জাতিকে ভাঙার কৌশল হিসেবে সামাজিক আতঙ্ক সৃষ্টি, শত্রুর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ন্ত্রণ করা, এবং পুরুষদের মানসিকভাবে ভেঙে ফেলা। বলপূর্বক গর্ভধারণ, ক্যাম্পে যৌন দাসত্ব, এবং গণধর্ষণ- 'all fit Fanon's interpretation of sexual violence as a weapon of domination.'[৭২] এখানে ১৯৭১-এর অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যার জন্য ফ্যাননের বক্তব্য, 'Colonialism is not content to impose silence; it violates the body itself' অত্যন্ত

প্রাসঙ্গিক। সুতরাং ফ্যাননের যৌন সহিংসতা তত্ত্ব দেখায় যে– যৌনতা হলো রাজনৈতিক অস্ত্র, দেহ হলো শাসন ও প্রতিরোধের কেন্দ্র, বর্ণবাদ যৌনতাকে ব্যবহার করে দখলদারিত্ব বজায় রাখে, এবং যৌন সহিংসতা হলো রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কৌশল। এ কৌশল কখনো সামাজিক সংস্কারের মোড়কে, কখনো ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে, কখনোবা বি-উপনিবেশায়নের আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কখনো সেটা নয়া-উপনিবেশবাদকে টিকিয়ে রাখার সর্বশেষ ও বর্বরোচিত কলা-কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ যৌন সহিংসতার রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছিল নারীর প্রতি বা ঔপনিবেশিক শরীরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতেই। তাই এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, *জমীদার দর্পণে* মীর সাহেব যে চিত্রটি তুলে ধরেছেন তা মূলত সাদা বিচারক ও তাঁদের প্রতিনিধি জমিদার কর্তৃক ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ এবং অনাচার ও অন্যায্যতারই প্রতিবিম্ব।

তাছাড়া এ যৌন নির্যাতনের বিচারকার্যের ধারণাকে ভারতীয় সামাজিক কৌলীন্য ও কুসংস্কারচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারণা থেকেও ব্যাখ্যা করা যায়। উনিশ শতকের শুরুর দিক থেকেই ব্রিটিশ আইনে ও আদালতে ধর্ষণকে সহিংস অপরাধ ('crime of violence') হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু খোদ ব্রিটেনে এ যৌন সহিংসতার বিচার পেতে বা প্রমাণ করতে বাদীকে একটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। যেমন– ধর্ষিত হওয়ার সাথে সাথে বাদী বিভিন্ন কারণে কোর্টে উপস্থিত হতে পারে না। অথবা, লোকলজ্জার ভয়ে মামলা করতে, কিংবা মামলা করলেও তার খরচ বহনের সক্ষমতা বা বাদী ও বিবাদীর সামাজিক শ্রেণিকাঠামোয় ব্যবধানের ফলে অনেক সময় দু'পক্ষের মধ্যে আপস মীমাংসা এবং জুরিবৃন্দ, বিচারকগণ ও ম্যাজিস্ট্রেটের বিদ্বেষপরায়ণ জেরার ভয়ে শেষ পর্যন্ত ধর্ষিত নারী মামলা করতেই সাহস করে না। মার্টিন উইনার এই যৌন হয়রানি বা ধর্ষণের মামলা না করার এই প্রতিবন্ধকতাকে 'পরিশ্রবণ' ('filters') হিসেবে অবহিত করেছেন।[৭৩] এলিজাবেত কলসকি উইনারের কথার সূত্র ধরেই বলছেন, এ সহিংস অপরাধের প্রতিকার পেতে যদি ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডেই এতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেখানে আইন দ্বারা প্রতিকারের বিধানের প্রচলন রয়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষে ভারতীয় নারীদের জন্য এটা আরো কতটা কঠিন তা সহজেই অনুমেয়, যদিও একই ধরনের আইন ভারতেও প্রচলন করা হয়েছে। তিনি এতদ্অঞ্চলের মহিলাদের বিচার না পাওয়ার জন্য দু'টো গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, প্রথম থেকেই তারা বিচারকের কাছে মিথ্যা অভিযোগ আনয়নকারী হিসেবে সন্দেহের পাত্রী হিসেবে বিবেচিত হতো। দ্বিতীয়ত, স্থানীয়দের সাক্ষ্য সম্পর্কে অবিশ্বাসের পূর্ব ধারণা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা ব্রিটিশ বিচাকদেরকে বাদী সম্পর্কে দ্বিগুণ সন্দিহান করে তুলতো। তাই ভিক্টোরিয়ান ভারতে যৌন সহিংসতার বিচার পাওয়ার আশা গুড়েবালি।[৭৪] এছাড়াও শেভারস আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ করে ব্রিটেন ও ভারতের যৌন সহিংসতার আইন পরিচালনার নিয়ামক হিসেবে মেডিকেল তদন্তের একটি তুলনামুলক পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁর বইতে একে 'embodying clear and practical expositions of the various and peculiar modes by which the natives of this country are wont to effect crimes against

the person, and to attempt their concealment' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৭৫] ব্রিটেনে বিচারকার্য পরিচালনায় মেডিকেল তদন্তকে একটা আইনগত সাধারণ বিষয় হিসেবে দেখা হয় এবং এতে বাদী স্বেচ্ছায় বা স্বতঃস্ফুর্ততা নিয়ে সাহায্য করে প্রকৃত দোষীকে খুজেঁ বের করতে।[৭৬] কিন্তু, ভারতের নিম্ন শ্রেণির মানুষরা এ তদন্ত কার্যক্রমকে দেখে বিচার বিভাগের অস্পষ্ট অন্তর্নিহিত প্রতারণা হিসেবে।[৭৭]

বিচারকের এহেন অন্যায্য বিচার বা প্রহসন জমিদারকে উসকে দিয়েছিল পরবর্তী অন্যায় করতে। তাই জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করায় জমিদার আবুর বাড়িঘর ভেঙ্গে চুড়মার করে দিয়ে সকল বিষয়-সম্পত্তি লুটে নেয়। আবু কপর্দকশূন্য হয়ে গ্রাম ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালো। জমিদার কর্তৃক এহেন নির্যাতনের বহু উদাহরণ উনিশ শতকের বিভিন্ন নিম্ন আদালতে নথিবদ্ধ রয়েছে। জমিদারের বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে কপর্দকশূন্য হয়ে গ্রাম ছাড়া হওয়া। সিরাজুল ইসলাম নদীয়া জেলার জমিদারি পরগনার একটি সার্ভে করে এহেন কর্মের উদাহরণ দিয়েছেন। যেখানে জমিদারের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের কোনো অভিযোগ সাধারণত থানাগুলো গ্রহণ করত না, উল্টো থানার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে নানান অভিযোগে তাকে হয়রানি করত। শুধু তাই নয় থানার লোকজনই অভিযোগ করার দায়ে অভিযোগকারীকে জমিদারের কাছারিতে নিয়ে যেতো। জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনী অভিযোগকারীর ওপর জমিদারের নির্দেশে আক্রমণ করত এবং তাকে বসতবাটি থেকে শুধু উচ্ছেদই নয়, কখনো কখনো হত্যাও করতো।[৭৮] অর্থ্যাৎ নাটকে আবুর বাড়িঘর নিশ্চিহ্ন হওয়ার যে দৃশ্য অবতারণা করা হয়েছে তা অবান্তর নয়। আবুর এ করুণ পরিণতি প্রমাণ করে যে, নাটকের বর্ণিত দৃশ্যসমূহ প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী বাংলার অধিকাংশ জমিদারেরই আসল পরিচয়। কিন্তু আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, এরপরও মীর মশার্‌রাফ হোসেন জমিদারির পতন নিয়ে বা জমিদারি প্রথার অবসানে সরাসরি কোনো বক্তব্য রাখেননি। বরং তিনি এ বিচারহীনতার যে ঔপনিবেশিক কাঠামো সেটার পরিশুদ্ধতা চেয়েছেন ভারতেশ্বরী রানি ভিক্টোরিয়ার কাছে। আবু মোল্লা কপর্দকশূণ্য হয়ে দাঁড়িয়েও ভারতেশ্বরীর কৃপা কামনা করছেন, মিনতি করছেন, বিচার চাইছেন। অর্থ্যাৎ মীর মশার্‌আফের তখনো ভরসা ছিল ব্রিটেনের রানি চাইলে এ ঔপনিবেশিক শাসনের পদস্থখলন দূর করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। একেই অনুরাধা রায় ঔপনিবেশিক শাসন সংক্রান্ত মিথগুলোর প্রভাব হিসেবে দেখেছেন, বিশেষত 'ব্রিটিশ ভারতকে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান, সাম্য, স্বাধীনতা, এমনকি জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দিয়েছে। তার জ্ঞান ও মূল্যবোধকে সমৃদ্ধ করেছে। এক কথায় তাকে আধুনিক সভ্যতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে', তিনি 'এ মিথটিকে সবচেয়ে বলিষ্ঠতম এবং ঔপনিবেশিকতার সব থেকে বড় জয়ের দ্যোতক' হিসেবে মনে করেন।[৭৯] এখানেই উনিশ শতকে আমাদের অন্যান্য বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মতো ঔপনিবেশিক শাসনের সুফল লাভের ইউটোপিয়ান মিথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় মীর মশার্‌রাফ হোসেনকেও। কয়েকটি কারণ থাকতে পারে এ মানসিকতার পেছনে– প্রথমত, তিনি জমিদার না হলেও তার আত্মীয়-স্বজন বা পরিবারের মানুষদের অনেকেই জমিদার বা জমিদারির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, সে কথা তিনি নাটকের শুরুতেই জমিদার সম্পর্কে বয়ানের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত, হয়ত তিনি অন্যান্য বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মতোই মনে

করেন যে, আধুনিক ভারত নির্মাণে ঔপনিবেশিক সরকারের অবশ্যকতা রয়েছে। এবং তৃতীয়ত, যেহেতু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মধ্যেই জন্ম নিয়েছেন ও বেড়ে উঠেছেন তাই তার অবচেতন মনের ভাবনা শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোর পক্ষেই। তবে উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে ঔপনিবেশিক কাঠামোর প্রতিকূল আচরণের বিরুদ্ধে বারবার ন্যায্যতার বিধান চেয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর যে আকুতি প্রকাশ পেয়েছে সেটাকেও খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কারণ, এ ঔপনিবেশিক মানসিকতার মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ রোপণ করে দিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই।[৮০]

বাংলার ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে যে 'পরজীবী' শ্রেণির বিকাশ ঘটেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের হাত ধরে, মীর মশার্‌রাফ হোসেন তাদেরকে 'জানোয়ার' বা 'হায়ওয়ান' বলে সম্বোধন করেছেন। এ নামে সম্বোধন যথার্থ হয়েছে বলে ধারণ করা যেতে পারে ওপরে বিধৃত শোষণ-নিষ্পেষণের ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ বিবরণ থেকে। নাটকটিতে সমকালীন সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকারের বৈষম্য, দুঃশাসন-শোষণই প্রতিবিম্বিত হয়েছে ইতিহাসের দর্পণে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও নিপীড়নের নবযুগের সূচনা হয়েছিল ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে। ভূমির মালিকানা হারিয়ে দুঃখ-কষ্ট, দুঃশাসন-লাঞ্ছনা-বঞ্চনা যেন রায়তের জীবনে চিরস্থায়ী রূপ নিয়েছিল দু'শত বছরের ঔপনিবেশিক শাসনামলে। ভূমিকেন্দ্রিক নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ক্ষণে ক্ষণে উপস্থিত হওয়া পরজীবী শ্রেণির পুঁজি বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে ধনী থেকে ধনী হওয়ার এবং শোষণের সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার করার সুবিধা করে দিয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো। সাধারণ মানুষের বিচার বা আইনগত সুবিধা/বঞ্চনা পাওয়ার পেছনেও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ টিকিয়ে রাখার এক অনন্য কৌশল প্রতিবিম্বিত হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। এ শোষণ-শাসন, অত্যাচার-অনাচার ও নৈতিকস্খলন এবং আইনি বঞ্চনার ইতিহাসের অনুচ্চারিত ধ্বনিই উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ফুঠে উঠেছে নিদারুণ মানবতার আর্তি নিয়ে। ইতিহাসের সত্য ভাষণকে সাহিত্যে প্রকাশের যে ধারা মীর মশার্‌রাফ হোসেন ও তাঁর সমকালীন বুদ্ধিজীবীরা উন্মোচন করে গিয়েছিলেন, তা আজও এ অঞ্চলের যে কেনো অপশাসন-শোসনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বাঙালি জাতিকে পথ দেখাচ্ছে। কারণ, 'দেশগত ও কালগত জীবন মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্মে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্য সেই জীবনের প্রতিবিম্বিত রূপ। শিক্ষাভেদে, মনভেদে, আর্থিক-সমাজিক অবস্থানভেদে মানুষের জীবন-চেতনা বিভিন্ন হয়। কাজেই সাহিত্যও হয় বিভিন্ন স্তরের, আদর্শের ও লক্ষ্যের।'[৮১] তাই ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে লেখক যে প্রতিবাদী সাহিত্যের সৃষ্টি করলেন তা মূলত সমকালীন সময়ের প্রত্যক্ষদর্শীরই বর্ণনা, যেখান ইতিহাস মানবিক হয়ে ওঠে উপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে চেতনাকে উসকে দেয় মুক্তির শ্লোগান তুলতে।

তথ্যনির্দেশ

১ Sir Thomas Stamford Raffles, Quoted by Lawrence Krader, *The Asiatic Mode of Production. Sources, Development and Critique in the Writings of Karl Marx,* (Van Gorcum & Company, Netherlands, 1975), p. 67

২ ভ. ই. পাভলভ, *ভারতে পুঁজিতন্ত্র উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত*, (প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪), পৃ. ৪৪

৩ রামশরণ শর্মা, *ভারতে সামন্ততন্ত্র*, (কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৭৭), পৃষ্ঠা. ২৩০

৪ আবু দায়েন, 'মীর মশররাফ হোসেন ও তাঁর জমিদার দর্পণ নাটক', ভূমিকা, *জমিদার দর্পণ*, মীর মশাররাফ হোসেন, ঢাকা, ২০১২

৫ এম. মোফাখ্খারুল ইসলাম এ ধনী কৃষকের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, "…those who had more land than they could cultivate with the help of family labour" (আরও জানতে দেখুন, *An Economic History of Bengal,* (Dhaka, 2012), p. 143), বুকানন হ্যামিলটন এ ধরনের কৃষক সম্প্রদায়কে জোতদার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাঁর ভূমি জরিপে (*A Geographical, Statistical and Historical Description of the District or Zila of Dinajpur in the Province or Subah of Bengal*, (আরও দেখুন, Calcutta, 1833)। রজত রায় ও রত্না রায়ও মনে করেন যে, বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এ ধরনের কৃষক সম্প্রদায় ছিলেন। যারা সাধারণ রায়তের চাইতে বেশি পরিমাণ জমি তাদের দখলে ছিল বা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন (আরও জানতে দেখুন, Rajat Ray and Ratna Ray, 'The Dynamics of Continuity in Rural Bengal Under the British Imperium: a Study of Quasi-Stable Equilibrium in Underdeveloped Societies in a Changing World', *The Indian Economic and ocial History Review*, Vol. 10, Issue 2, 1973.)। কিন্তু সুগত বোস ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন, এ ধরনের কৃষক শ্রেণি বা জোতদাররা শুধুমাত্র উত্তর বঙ্গেই ছিল। দক্ষিণ বা পূর্ব বঙ্গে এমন কৃষকের অস্তিত্ব ছিল না (আরও দেখুন, *Agrarian Bengal: Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947,* Cambridge, 1986

৬ Jacques Derrida, "Force of Law," in *Deconstruction and the Possibility of Justice,* eds. Drucilla Cornell *et al.,* pp. 3-67 (New York: Routledge, 1992)

৭ *Ibid*., p.15

৮ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (Vintage, New York, 1977), p.182

৯ Judith Butler, *Excitable Speech: A Politics of the Performative* (Routledge, New York, 1997), p.45

১০ Augusto Boal, *Theatre of the Oppressed* (Pluto Press, London, 1979), p.67.

১১ Foucault, *Discipline and Punish*, p.185.

১২ Derrida, "Force of Law," p.21.

১৩ Victor Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure* (Aldine, Chicago, 1969), p.94.

১৪ *Ibid.,* 97

১৫ Boal, *Theatre of the Oppressed,* p.67

১৬ *Ibid.,* p.70

১৭ Foucault, *Discipline and Punish,* pp.182–185

১৮ Boal, *Theatre of the Oppressed,* pp.67–72

১৯ Foucault, *Discipline and Punish,* p.200; Boal, *Theatre of the Oppressed,* pp.75–80

২০ Lester Hutchinson, *The Empire of the Nababs,* (London, 1937), p. 91

২১ John Herbert Harington, *Elementary Analysis of the Laws and Regulations,* Vol. III (Clacutta, 1817), pp. 399- 400

২২ ইরফান হাবিব, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা*, (কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৫), পৃ. ১৫০

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

২৫ *The Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East India Company*, p. 81

২৬ *Second Report of Select Committee*, 1808-12, App. IX, p. 103

২৭ *Land Revenue Policy of the Government of India*, (Calcutta, 1902), p.8

২৮ *Report of the Land Revenue Commission*, (Calcutta, 1940), pp. 35-36

২৯ Morris D. Morris, 'Values Obstacles to Economic Growth in South Asia: An Historical Survey', *The Journal of Economic History*, Vol. XXVII, No. 4

৩০ M. Mufakharul Islam, 'Some aspects of the problem of subinfeudation in Undivided Bengal', *Indian Economic and Social History Review*, Vol. 20 (2), (Sage, Delhi, 1983) p. 205

৩১ উদ্ধৃতি, সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, (কলকাতা, ১৯৭২), পৃ. ১৩৯

৩২ A. A. Abdullah, *Landlord and Rich Peasantss Under the Permanent Settlement*, (Dhaka, 1980), p.45

৩৩ Ratnalekha Ray, *Change in Bengal Agrarian Society*, (New Delhi, 1979), p. 49

৩৪ M. Mufakharul Islam, *An Economic History of Bengal*, (Dhaka, 2012), p. 114

৩৫ Tara Chand, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. I, New Delhi

৩৬ *Report of the Bengal Land Revenue Commission*, Vol. II, (Calcutta, 1940), p. 37

৩৭ Tapan Raychaudhuri, 'Permanent Settlement in Operations: Bakergunj District, East Bengal', Robert Eric Frykenberg (Edited), *Land Control and Social Structure in Indian History*, (Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1969), p. 163

৩৮ B. H. Baden-Powell, *The Zamindary Settlement of Bengal*, Vol. I, (Calcutta, 1896), pp. VIII-IX

৩৯ মীর মশার্‌রাফ হোসেন, *জমীদার দর্পণ*, (কলিকাতা, ১৭৭৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১

৪০ Arthur Bemdtson মনে করেন, "The theory of catharsis has a disarming affinity with the expressional theory, since it emphasizes emotion, asserts a change in emotion as a result of aesthetic operations, and concludes on a note of freedom in relation to the emotion." (*Art, Expression, and Beauty*, (Holt, Rinehart and Winston, New York, 1969), p. 253); Richard Levin মন্তব্য করেন যে, "Catharsis in Shakespearean tragedy involves ... some kind of restoration of order and a renewal or enhancement of our positive feelings for the hero." (*Looking for an Argument: Critical Encounters with the New Approaches to the Criticism of Shakespeare and His Contemporaries*, (Fairleigh Dickinson University Press, 2003), p. 42.

৪১ অশীন দাশগুপ্ত, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, (কলকাতা, আনন্দ, ১৯৮৯), পৃ. ২৯-৩০

৪২ আবুল কাসেম ফজলুল হক, *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি ও বাংলা সাহিত্য*, (ঢাকা, ২০১২), পৃ. ৩১

৪৩ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, *বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্য-সাহিত্য*, (কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭৭

৪৪ মীর মশার্‌রাফ হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬

৪৫ দেখুন, *The fifthe Report from the Select Committee*, Vol. I, (London, 1812), পৃ. ১৫৪, ৩৩৮, ৭৮৮, ৮০৬

৪৬ কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম প্যাঁচার নকশা*, (কলিকাতা, ১৮৬২, ২য় মুদ্রন), পৃ. ১৭

৪৭ মীর মশার্‌রাফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৪৮ দেখুন, বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ১ম; ২য়; ৩য়; ও ৪র্থ খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৬০)।

৪৯ মীর মশার্‌রাফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৫০ R. H. Hollingbery, *The Zemindary Settlement of Bengal*, Vol. I, (Calcutta, 1879), p. 77

৫১ মীর মশার্‌রাফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৫২ R. H. Hollingbery, *op.cit*, Vol. I, p. 275

৫৩ Sirajul Islam, 'Involvement of Zamindars and Planters in Criminal Activities in a District of Colonial Bengal: Nadia', *International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)*, Vol. III, Issue-V, March 2017, pp. 174-191.

৫৪ মীর মশার্‌রাফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৫৫ R. H. Hollingbery, *op. cit*, Vol. I, p. 276

৫৬ মীর মশার্‌রাফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৫৭ Elizabeth Kolsky, 'The Rule of Colonial Indifference: Rape on Trial in Early Colonial India, 1805–57', *The Journal of Asian Studies*, Vol. 69, Issue 4, November 2010, p. 1094

৫৮ বিস্তারিত দেখুন, Nancy Paxton, *Writing under the Raj: Gender, Race and Rape in the British Colonial Imagination, 1830–1947*. (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1999); Jenny Sharpe, *Allegories of Empire: The Figure of Woman in the Colonial Text*¸ (Minneapolis: University of Minnesota Press,1993)

৫৯ Jock Mcculloch, *Black Peril, White Virtue: Sexual Crime in Southern Rhodesia*, 1902–1935. (Bloomington: Indiana University Press, 2000). Annlaura Stoler, *Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule*, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2002)

৬০ Frederick Cooper, and Stoler Laura Ann (eds.), *Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World*, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1997)

৬১ Elizabeth Kolsky, 'The Rule of Colonial Indifference', p. 1110

৬২ Frantz Fanon, *Black Skin, White Masks* (New York: Grove Press, 1967), pp. 110–140

৬৩ Frantz Fanon, *A Dying Colonialism* (New York: Grove Press, 1965), pp. 35–67

৬৪ *Ibid*., pp. 40–42

৬৫ Fanon, *Black Skin, White Masks*, pp. 45–60

৬৬ M. Bourke, *Rape in War* (London: Reaktion Books, 2007), pp. 89–122

৬৭ Gayatri Chakravorty Spivak, "Can the Subaltern Speak?", 1988

৬৮ Sumit Sarkar, *Modern India* (Delhi: MacMillan, 1983), pp. 145–147

৬৯ Beatrice O. Omwomo, *Revisiting Frantz Fanon in The Era of Globalization*, (Miami University, Oxford, Ohio, 2011, Unpublished Thesis).

৭০ Philippa Levine, *Prostitution, Race and Politics* (Routledge, 2003), pp. 112–118.

৭১ Suruchi Thakur and Latika Sengupta, *Women and Partition: Remembering the Subcontinent* (Zubaan, 2010).

৭২ Anne McClintock, *Imperial Leather* (Routledge, 1995), pp. 45–90

৭৩ Martin Wiener, *Men of Blood: Violence, Manliness and Criminal Justice in Victorian England* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 78

৭৪ Elizabeth Kolsky, "The Body Evidencing the Crime': Rapeon Trial in Colonial India, 1860–1947", *Gender & History*, Vol. 22, No.1, April 2010, p. 111

৭৫ Norman Chevers, *A manual of medical jurisprudence for Bengal and the North-Western Provinces*, (Calcutta: F. Carbery, Bengal Military Orphan Press, 1856), p. 1

৭৬ *ঐ*, পৃ. ৬

৭৭ Norman Chevers, *A manual of medical jurisprudence for Bengal and the North-Western Provinces*, (Calcutta: F. Carbery, Bengal Military Orphan Press, 1856), p. 8.

৭৮ Sirajul Islam, *Op cit.* pp. 179-180

৭৯ স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*, (কলকাতা ২০০৩), পৃ. ২৫৯

৮০ বিস্তারিত দেখুন, Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, (Verso, London and New York, 2006)

৮১ আহমদ শরীফ, *ইতিহাস ও সমাজচিন্তা*, (ঢাকা, ২০০১), পৃ. ৩০৮